দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 DEC 1993
পৃষ্ঠা 4 কলাম ৬

২০টি সাবমেরিনের মূল্যে নয়টি দেশের শিশুদের শিক্ষার নিশ্চয়তা

গুলশান আখতার

বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নয়টি দেশের শীর্ষ নেতারা বৃহস্পতিবার ১৬ ডিসেম্বর ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন। এটিই বিশ্বের সর্বপ্রথম শিক্ষা বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন। বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিসর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজিরিয়া এবং পাকিস্তান এ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল।

এই সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসাবে ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল তিন দিনব্যাপী 'প্রাক শীর্ষ সম্মেলন'। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের বৈষম্য, শিক্ষা ও জনসংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক, জন অংশগ্রহণের গুরুত্ব এবং তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে মন্ত্রী, সাহায্যদাতা ও অন্যান্য পদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর নেতৃবৃন্দ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে নিজ নিজ দেশের নিরক্ষতার হার দ্রুত কমিয়ে আনার শপথ নেন। ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইউএনএফপি-এর সহযোগিতায় এই শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। আর এর মাধ্যমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও শিশুমৃত্যু রোধ এবং উন্নয়নে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে বলে উদ্যোক্তারা আশা প্রকাশ করেন।

ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নয়টি দেশেই বিশ্বের ৭০ ভাগ বয়স্ক অশিক্ষিতের বসবাস। বিশ্বের অশিক্ষিত শিশুর অর্ধেকের বেশি এখানেই আছে। দেশগুলোর ৭০ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো পায়নি। এ ধারা অব্যাহত থাকলে দু'হাজার সাল নাগাদ এ সংখ্যা পৌঁছবে ৮৩ মিলিয়নে।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণায় জানা গেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। গবেষকদের মতে, বাংলাদেশসহ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নয়টি দেশের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে চার থেকে পাঁচশ' কোটি ডলার প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় এ অর্থের পরিমাণ মাত্র ২০টি মাঝারি আকারের অপারমাণবিক সাবমেরিনের মূল্যের সমান। এ প্রসঙ্গে ইউনিসেফ মন্তব্য করেছে, এ অঙ্ক বিশাল মনে হলেও আমাদের সামর্থ্যের অতীত নয়।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার পাশাপাশি একটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। দুনিয়ায় যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। এজন্যই শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা, তার পরবর্তীকালে ১৯৫৯ সালে শিশু অধিকারের ঘোষণা এবং ১৯৮৯ সালের শিশু অধিকার সনদেও এ সত্যের স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। শিশু অধিকারের দলিলগুলোতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব শিশুর জন্য সর্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

আজ পৃথিবী জুড়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ব্যাপকতর শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তিভূমি। এ প্রসঙ্গে দেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন সম্প্রতি শিক্ষা বিষয়ক একটি সেমিনারে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'গত কয়েক দশকে শিক্ষার অর্থনৈতিক মূল্য নিয়ে অর্থনীতিবিদরা প্রচুর গবেষণা করেছেন। এ সত্য আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রাথমিক শিক্ষা শুধু যে প্রতিটি শিশুর মানবিক গুণাবলী অর্জন এবং দেশের সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন তা নয়। জনগণের বুনিয়াদি শিক্ষা একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। উনিশ শতকের শেষভাগে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশ এবং প্রাচ্যে সূর্যোদয়ের দেশ জাপান সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ পদক্ষেপ এসব দেশের আজকের অগ্রগতির পিছনে বড় রকমের অবদান রেখেছে।'

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হতে হবে সর্বজনীনতার ভিত্তিতেই। এখানে কোন রকমের গোঁজামিল বা ভ্রান্তনীতি মূল উদ্দেশ্যকে করবে মারাত্মকভাবে ব্যাহত। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য বর্তমানে প্রচলিত বিচিত্র ত্রিমুখী শিক্ষাধারাকে মূলত দায়ী করা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানে 'একই পদ্ধতির', 'গণমুখী' ও 'সর্বজনীন' শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও আমরা এই আধুনিক প্রগতির যুগে এক বিচিত্র ত্রিমুখী শিক্ষাধারার বিভ্রান্ত স্রোতে ভেসে চলেছি মূল লক্ষ্যকে পাশ কাটিয়ে। এই প্রবণতাকে মোটেই এদেশের জনগণের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের অনুকূল বলে বিবেচনা করা যায় না।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদের বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৯২)-এ দেশের শিক্ষার হাল-হকিকত নিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে— 'দেশের শিক্ষাব্যবস্থা একটি গণমুখী এবং সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এজন্যই এদেশ বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে মুক্তি পায়নি।'

এই রিপোর্টে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে, 'The non-uniformity of education and facilities have also helped create a divisive society.'

উপরোক্ত মন্তব্যের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী প্রণীত 'শিক্ষার মান ও পরিবেশ' শীর্ষক একটি মূল্যবান-প্রবন্ধে। এখানে তিনি বলেন, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ৪ নবেম্বর, ১৯৭২ সালে। তারপর একুশ বছর পেরিয়ে গেছে। এই একুশ বছরে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির শিক্ষা বিষয়ক অঙ্গীকার আজও পূরণ হয়নি। শুধু পূরণ হয়নি বললেও হবে না, অঙ্গীকারের প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ— একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা— সেই ব্যাকাংশের মর্মার্থ ভুলে গিয়ে তার নিহিতার্থকে উপেক্ষা করে যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু হয়েছে তা সামাজিক বৈষম্যকে টেনে এনেছে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও শ্রেণীবৈষম্যকে স্পষ্টতর করেছে। ভবিষ্যতেও পরিবর্ধমান বৈষম্যকে দূর করার কাজকে দুঃসাধ্য করে তুলেছে। আমাদের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় তিনটি বিভিন্নমুখী ধারার

(১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

২০টি সাবমেরিনের মূল্যে

(৪-এর পৃষ্ঠার পর)

সহাবস্থানে জাতিকে শুরুতেই ত্রি-খণ্ডিত করেছে; ঐক্য ও সংহতির সম্ভাবনাকে করেছে সুদূরপরাহত।

বাংলা মাধ্যম, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজী মাধ্যমে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা যেমন ব্যাহত করছে তেমনি জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূলে গোড়াতেই মারাত্মক আঘাত হানছে। নয়াদিল্লীর এই শীর্ষ সম্মেলনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যাকে সমস্যাও বলা যায়, উত্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে এ সমস্যাটি প্রকট। এ হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের বৈষম্য। সরকার অবশ্য মেয়েদের শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের অন্যতম উপায় হিসাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন। ইউনিসেফের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মাত্র ৫০ শতাংশ মেয়ে নাম লেখায়, ছেলেদের ক্ষেত্রে এই হার ৭০ %। এখানে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে স্কুল ছেড়ে দেয়ার ঘটনা অত্যন্ত বেশি। গড় হিসাবে গোড়ায় ভর্তি হওয়া প্রতি ১০ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন শেষপর্যন্ত ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত যায়। ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলেদের ২৩% ভাগ এবং মেয়েদের ১০% ভাগ মাত্র স্কুলে যায়। মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ না পাওয়ার অর্থ উপযুক্ত কাজ না পাওয়া, নিয়মিত রোজগার থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অসহায়ভাবে অন্যের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া। নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য বিশেষ করে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

এই শীর্ষ সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আশা করছেন যে, এর মাধ্যমে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও শিশুমৃত্যু রোধ এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। এ কথা সত্য যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও পরিকল্পিত পরিবারের মধ্যে রয়েছে পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছে বিশ্বের নয়টি জনবহুল, উন্নয়নশীল দেশ। শিক্ষা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যাকে প্রধান জাতীয় সমস্যা বললে অত্যুক্তি হয় না। এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার বর্গকিলোমিটারের এ দেশটিতে জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২.৪৬। এ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে ২০০০ সাল নাগাদ এ দেশের জনসংখ্যা ১৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতিসংঘ নির্দেশিত ১- %-এ সীমিত রাখার জন্য জোর উদ্যোগ নিতে হবে।

একজন শিক্ষিত মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণের বিষয়টির সঙ্গে নিজেকে যেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেন, একজন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তি সঙ্গত কারণেই তা পারেন না। এজন্যই এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টির পাশাপাশি গণমুখী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

শিশুমৃত্যুর কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত পিতামাতার কারণে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিশুর মৃত্যু ঘটে। শিশুর খাদ্য, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ, শিশু পরিচর্যার বিষয়গুলো শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে যতবেশি আয়ত্ত করা সম্ভব অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে সেভাবে সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ৯৪ জন অপুষ্টিতে ভুগছে। এসব শিশুর পিতামাতারা অধিকাংশই নিরক্ষর, দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন।

বিশ্বজুড়ে এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। শীর্ষ সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেই সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। জাতির উন্নতির অন্যতম শর্ত হচ্ছে সর্বজনীন গণমুখী শিক্ষায় সচেতন একটি জাতির সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।

২০টি মাঝারি সাবমেরিনের মূল্য থেকে নয়টি দেশের শিশুশিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব —এ তথ্যটি বর্তমান ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ যুদ্ধংদেহী পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন ও শান্তির প্রত্যাশী মানুষের কাছে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান একটি তথ্য। কোটি কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে মারণাস্ত্রের পিছনে, মানব সভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়ছে, পরাশক্তি ও বৃহৎশক্তিরা যতখানি না মানব কল্যাণে, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। শক্তি প্রদর্শনের অশুভ তৎপরতায় শান্তির কপোত অস্তিত্বের জন্য মরিয়া হয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছে। অথচ মানব কল্যাণ বিশেষ করে ভবিষ্যত প্রজন্ম শিশুদের কল্যাণে সে তুলনায় খুব সামান্যই ব্যয় হচ্ছে।

মানুষ তার রক্ত, ঘাম, মেধা-মনন, ধৈর্য আর অধ্যবসায় দ্বারা তিল তিল করে যে সভ্যতা নির্মাণ করেছে তা আজ প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধংদেহী পৃথিবীর অশুভ চীৎকারে থর থর করে কাঁপছে। সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে বিশ্ববাসী আজ শঙ্কিত। পৃথিবীর যাবতীয় অকল্যাণ রোধ করতে হলে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। জীবনের অনিশ্চয়তা এবং সঙ্কটকে কাটাতে হলে উন্নয়নের স্রোতধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য প্রধান ও প্রথম শর্ত হলো একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। উন্নত দেশগুলো অস্ত্র প্রতিযোগিতায় কোটি কোটি ডলার ব্যয় না করে অথবা এ খাতে তাদের ব্যয় সংকোচন করে যদি অনুন্নত দেশগুলোর কল্যাণমূলক কার্যক্রমে সাহায্যের হাতকে শর্তহীনভাবে আরও সম্প্রসারিত করত তাহলে এতদিনে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হতো। যে সভ্যতা তারা নির্মাণ করেছে বলে দাবি করে— আজ তারা নিজেরাই মারণাস্ত্রের বিধ্বংসী হেলায় যে কোন মুহূর্তে তা ধ্বংস করে দেয়ার পাঁয়তারা করছে। যুগ যুগ ধরে নির্মিত মানব সভ্যতার প্রতি উন্নত দেশের অধিবাসীরা এবং আমরা যদি শ্রদ্ধাশীল হই তাহলে মানব কল্যাণমূলক কার্যক্রমকেই আমাদের উৎসাহিত করতে হবে। একে এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা থেকে শুরু করে সার্বিক সহযোগিতার সুষ্ঠু-সুশৃঙ্খল একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিক্ষাই যে মানবকল্যাণমূলক কার্যক্রমের প্রথম কথা সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।